আনন্দবাজার পত্রিকা

সংবিধানে যাঁদের ‘আমরা’ বলেছিল, সংবিধান উদ্‌যাপনে তাঁরা ‘ওরা’

আনন্দের দৃশ্য, না কি ভয়ের

কুমার রাণা

১০/০২/২০২০

তান মেনকে ডর নাগেনি কি গো! মোকে তো ডরায়টে!— টেলিভিশনের ছবি দেখে প্রশ্ন, যারা ওখানে বসে দেখছে, তাদের ভয় লাগছে না? তার তো ভয়ে কাঁপুনি আসছে। সে শেফালি। তিন সন্তানের মা, বয়স পঁচিশ, অবশ্য পঁয়ত্রিশ-পঁয়তাল্লিশও হতে পারে। বয়স সর্বদা বহিরঙ্গে পরিস্ফুট নয়। বাড়ি, দেশ, আত্মজ ও আত্মীয়দের ছেড়ে সে বিভুঁইয়ে, কলকাতায়। ঘরে ভাত নেই, গাঁয়ে কাজ নেই। বাবুদের সে দিন ছুটি, অতএব টেলিভিশন চলছিল। ছুটি কী জিনিস সে জানে না (“ছুটি তো চাকরিয়া নোকের, আমার তো খাটি খিয়া”)। টেলিভিশনে এমন অস্ত্রসজ্জিত প্রদর্শনীও কখনও দেখেনি (“আমার ঘরে কি টিভি আছে? পরের ঘরে কভু দেখি, সে সাঁঝবেলা, দিনাবেলায় কি টিভি দেখার সময় আছে?”) তার ভয় করছিল। কারণ, সে পুলিশ দেখেছে, আশৈশব জেনেছে পুলিশকে ভয় পেতে

হয়। টিভিতে যাদের দেখছে তাদের সাজপোশাক পুলিশের মতোই, বন্দুক উঁচিয়ে আছে। দূরদর্শনের উদার পর্দায় ভাসছে সেনাবাহিনীর প্রতাপান্বিত কুচকাওয়াজ, লোক-হন্তারক অস্ত্রসম্ভারের শিহরন জাগানো প্রদর্শন, প্রজা-দমনের হুঙ্কার।

উপলক্ষ— সংবিধান দিবস। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি। "আমরা, ভারতের জনসাধারণ'' ...আমাদের নিজেদেরকে এই সংবিধান দিয়েছিলাম। সংবিধানের প্রস্তাবনা তার অন্তর্বস্তু বিষয়ে যা বলে, তা হল মানবিকতার অভিজ্ঞান। জাতি গঠন এবং জাতির ঐক্য ও সংহতি রক্ষার লক্ষ্যে ব্যক্ত প্রতিটি উদ্দেশ্য— ন্যায্যতা, স্বাধিকার, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব একান্ত ভাবে মানবকেন্দ্রিক। এর মধ্যে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, বিত্ত, কোনও কিছুরই স্থান নেই। সহ-মর্যাদার স্বীকৃতি থেকে গড়ে ওঠা আমাদের সংবিধানের ঘোষণাগুলোতে তাই যান্ত্রিকতার স্থান নেই। অথচ, প্রজাতন্ত্রের যে মহিমা আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় তা দ্বিধাহীন ভাবে যান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্রের নামে প্রজাদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করার হুমকি। দেশের গৌরব, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার এবং তাকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবার প্রতিজ্ঞার আবরণে প্রজাদের সামনে তুলে ধরা হয় মানুষের ব্যক্তিসত্তা রোধকারী ও বিচারবুদ্ধি বিলোপকারী এক কৃত্রিম অবয়ব। তার আড়ালে ঢাকা পড়ে প্রজাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। হুকুম আসে, মানুষের বিপন্নতাগুলোকে ভুলে যেতে হবে। যা মানুষের স্বাধিকার উদ্‌যাপন হওয়ার কথা ছিল, তা হয়ে দাঁড়ায় মানুষকে বাইরে রেখে এক ঘোর অমানুষী শক্তির তন্ত্র-আরাধনা।

শেফালির মতোই দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের পক্ষে শক্তির এই আরাধনায় যোগ দেওয়ার সুযোগ নেই। তাঁদের সময় বয়ে যায় অন্নের সন্ধানে, জীবনধারণের উপকরণের খোঁজে। ভারত সরকার মানুষের খাদ্যগ্রহণের একটা ন্যূনতম মাত্রা ধার্য করেছে। অথচ, সম্প্রতি সরকার প্রকাশিত এক নথি (ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনাল সিকিয়োরিটি ইন ইন্ডিয়া ২০১৯) জানাচ্ছে, যাঁরা মাসিক মাথাপিছু ব্যয়ের দিক দিয়ে নীচের ত্রিশ শতাংশ, সেই দরিদ্রতমরা ন্যূনতম মাত্রারও ক্যালরি, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় খাদ্য জোটাতে পারেন না। এই ত্রিশ শতাংশের মধ্যে যাঁরা আবার চিরায়ত ভাবে বঞ্চিত, আদিবাসী, দলিত, অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর লোক— নথি বলছে—তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ। বিজাতীয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর দেশের খাদ্য উৎপাদনে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। অথচ এখনও দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব বিপন্ন। তাঁদের মধ্যে কিছু অংশ অনাহারে মারা যান, কিছু অংশ জীবন্মৃত। সহ-মানব হিসেবে তো দূরস্থান, তাঁদের পূর্ণমানব হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারই জন্ম ইস্তক অপহৃত। তাঁরা জন্ম নেন অপুষ্টি নিয়ে, খাদ্যাভাবে, শারীরিক-সামাজিক যত্নের অভাবে। মাত্রাতিরিক্ত শ্রমে তাঁদের মধ্যে অকালমৃত্যুর প্রাচুর্য (দেশের গড় আয়ু উনসত্তর, কিন্তু গড়ের এ দিক এবং ও দিকের মধ্যে ফারাকটা ভূমি ও আকাশের)। দৈহিক অপুষ্টি ও বলহীনতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে মানসিক অপুষ্টি— এঁদের জন্য থাকে না শিক্ষার ব্যবস্থা, থাকে না সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যোগদানের সুযোগ। সংবিধানে "আমরা ভারতের জনসাধারণ" বলে যে লোকসমূহের কথা বলা হচ্ছে, সেই সমূহের মধ্যে এঁদের স্থান হয় না।

দেহের দিক দিয়ে তাঁরা ঊনমানব তো বটেই। যেমন শেফালি, যার জন্মের সময় তার মায়ের বয়স ছিল চোদ্দো, আর নিজের প্রথম সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় যার বয়স পনেরো। দেশের আইন, আঠারো বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু সে আইন মেনে চলতে গেলে জীবনের কিছু ন্যূনতম নিরাপত্তা প্রয়োজন: "আমার মেয়েটার কিছু যদি হয়ে যায়, তখন সরকার দেখবে?" মা-বাপের, সমাজের, এই প্রশ্ন মনগড়া নয়। 'কিছু' তো অহরহই ঘটছে, এবং সেই অঘটন থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা যে নেই, তাও কারও অজানা নয়। দ্বিতীয়ত, আইনের মর্মার্থ বুঝতে গেলে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে ন্যূনতম পরিচয় থাকা দরকার। ''মা-ঠাকুমাদের তো এই বয়সেই বিয়ে হয়েছে, তাঁদেরও তো বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে, এখন কিসের সমস্যা?" এর উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তাঁদের মা-ঠাকুমারা যে জীবন যাপন করে এসেছেন, তাঁরা নিজেরাও যে জীবন যাপন করছেন, সে জীবন যে অনেক বেশি পূর্ণতর হতে পারে, এই বোধ গড়ে তোলায় কোনও উদ্যোগ এই দেশের শাসক নেয়নি। শাসকীয় উদ্যোগে, বরং, বারংবার তাঁদের মাথায় হাতুড়ি মেরে এটাই বুঝিয়ে আসা হয়েছে যে, "তোমরা জন্মেছ অন্যের সেবা করার জন্য, তোমাদের জন্য যা করা হচ্ছে সেটাকেই ভাগ্য বলে মেনে নাও।''

তার বেশি যদি কেউ কিছু চাইতে যায় তা হলে, "সাবধান, পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে!" শাসক ও শাসিতের এই সম্পর্ক পরম্পরায় প্রধান ভিত্তি হয়ে থেকেছে ত্রাস: "আমি যদি অন্য কিছু বলি, যদি আলাদা কিছু করি, যদি নতুন কিছু চাই, তা হলে আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।" ধরে নিয়ে যায়ও। অনন্যোপায় মানুষ যখন প্রচলিত বিধান ভাঙতে যায়, তখন তার সামনে যা এসে হাজির হয়, তার সঙ্গে ২৬ জানুয়ারির আত্মম্ভরী কুচকাওয়াজের মিলটা বড্ডই বেশি।

অতএব, শেফালির সন্তানদের মাকে ছেড়ে থাকার মমতাবর্জিত জীবন নিয়ে বেড়ে উঠতে হয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান শৈশবে মাতৃসংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকার অজস্র কুফলের কথা বলে; তার সবগুলো নিয়েই এই শিশুরা 'বড়' হয়। তাদের মা তাদের মানুষ করতে চেয়ে, সন্তান-বিচ্ছেদের হাহাকার বুকে চেপে, দিনে অবিশ্রাম খাটনি আর রাতে খণ্ড খণ্ড দুঃস্বপ্ন নিয়ে কাল কাটায়। এই শেফালিরা, এবং তাদের মতো শাসিত-ভাগ্য নিয়ে জন্মানো কোটি কোটি মানুষের কাছে মানবিক মর্যাদার কল্পনাটাও অধরা। অর্ধমানবের জীবন বাঁচার জন্যই তাঁদের কাউকে ঘর-পরিবার-দেশ থেকে দূরে, মনের কথা প্রাণের ব্যথা ভুলে উদয়াস্ত কাজ করে যেতে হয়।

ঘরে থাকতে পারার সৌভাগ্য যাঁদের থাকে তাঁদের সেটা অর্জন করতে হয় বহু অবিচার, বহু চাপিয়ে দেওয়া, মেনে নেওয়া দুর্ভাগ্যের বিনিময়ে। সংবিধানে এঁদের সবাইকেই 'আমরা' হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল, আর সেই সংবিধান উদ্‌যাপনে এঁরা একান্ত ভাবেই 'ওরা'। তথাকথিত ভারতমাতার এই উদ্‌যাপন আসলে সংবিধানের প্রকৃত প্রতিজ্ঞাটি লঙ্ঘনের উদ্‌যাপন, ব্যাপক মানুষের জীবন থেকে মর্যাদার চাদরের সুতোটুকুও কেড়ে নেওয়ার উদ্‌যাপন। সংবিধান ও তার উদ্‌যাপনের এই বৈপরীত্যেই ভারত আজ ভারতমাতায় পরিণত, মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে অমানবীয়-অতিমানবীয় শক্তির এই তন্ত্রসাধন।

আলোকরেখা এইটুকুই, আজ দেশ জুড়ে সংবিধানকে রক্ষা করার বিপুল, সাহসী, আশা-জাগানিয়া মুহূর্তগুলো গড়ে উঠছে। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, মানবিক হৃদয়ের স্পর্শে সেই আন্দোলনগুলি শাসকদের ত্রস্ত করতে না পারুক, হয়তো খানিক চিন্তিত করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তা শেফালিদের জীবনকে 'আমাদের' জীবনে মেলানোর দিকে উত্তীর্ণ হতে পারবে? মহাত্মা সব মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার পরম কর্তব্য নিজের এবং অন্যদের জন্য স্থির করে গিয়েছিলেন। নেহরু সে-কথা স্মরণ করে স্বাধীনতার লগ্নে দেশবাসীর সামনে অবিমিশ্র প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন, মানুষের অশ্রু মোছা ও তাকে দুর্ভোগ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার। তাঁর উচ্চারণে ছিল ভারতীয়ত্বকে বিশ্ব-মানবতার সঙ্গে যুক্ত করার আশ্বাস। মানতেই হবে, শাসক ও বৃহত্তর সমাজ সেই কাজ থেকে চ্যুত হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই কর্তব্য 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি'তে তার মূল্য হারিয়েছে।

বরং, আজ শাসকদের হাতে সংবিধানের অন্তর্বস্তু যে ভাবে প্রতি দিন পীড়িত হচ্ছে, সেই পীড়ন থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য প্রতিটি মানুষের চোখের জল মোছার কাজটা আরও অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। সামরিক হুঙ্কার নয়, দেশ আজ শুনতে চায় ভালবাসার সঙ্গীত। সংবিধান ও শেফালিদের জীবনকে কাছাকাছি আনতে হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের এই সমরসজ্জা যে হেতু সংবিধানের প্রতিজ্ঞার থেকে কেবল স্বতন্ত্র নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত— তাকেও আর এক বার নতুন করে বিবেচনা করতে হবে।